নজরুল ও শৈলজানন্দ

কবি নজরুল সমকালে সুহৃদ, স্বজন এবং সুজনদের চোখে কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে এই গ্রন্থে যাঁদের আলোচনা স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখার্জীর নামই সর্বাগ্রে আসে। শৈশব, কৈশোর এবং তরুণ বয়সে তিনিই ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু, সহপাঠি এবং সহচর। একই ক্লাসে পড়লেও একই স্কুলের ছাত্র ছিলেন না তাঁরা। কিন্তু তাঁদের দুজনার মধ্যেই একে অপরের প্রতি ছিল অমোঘ আকর্ষণ। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ, অপরজন বনেদী মুসলমান। অন্যান্যদের মধ্যে শৈলেন, যতীন ছিলেন খ্রীষ্টান। অবশ্য এঁদের বাইরে আরও বেশ কয়েকজন ছিলেন যাঁদের কথা শৈলজানন্দ তাঁর 'কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অসাধারণ একটি স্মৃতি কথা– অসাধারণ বন্ধুত্ব। উভয়ের সাহিত্যচর্চার অনেক আগে থেকেই এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। একজন কাজী পরিবারের সন্তান। দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে নিষ্পেশিত। মুঘল আমলের 'কাজী' খেতাব ও লাখেরাজ সম্পত্তিও পরবর্তীতে তাঁদের দারিদ্রকে ঠেকাতে পারেনি। অন্ন জোগাড় করতে গিয়ে তারা নিঃস্ব হয়েছিলেন। এই পরিবারে জন্ম নিয়ে নজরুল সেদিন দারিদ্র্যের জ্বালা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বোধকরি এই অনুভূতি থেকেই তিনি 'দারিদ্র্য' নামে এক অবিস্মরণীয় কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন। অপরজন শৈলজানন্দ বিস্তর বিত্তের মধ্যে বড় হয়েছেন। মা মারা যাবার পর তিনি মাতামহ ব্রিটিশরাজের খেতাব প্রাপ্ত 'রায় সাহেবে'র নাতী। সমাজে তখন রায় সাহেবের দারুণ প্রতিপত্তি।এমন উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর দুই দিগন্তে যাঁদের বাস, তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের এই মেলবন্ধন কীভাবে সম্ভব হয়েছিল! বন্ধুত্বের যখন শুরু, তখন সাহিত্যচর্চার কিছুই ছিলনা, সে সময়ের কথা শৈলজানন্দ বলেছেন তাঁর 'কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে' গ্রন্থে। পড়তে পড়তে এক সময় চোখ আপনিতেই ঝাঁপসা হয়ে ওঠে।

এঁরা দুজন একই জেলার হলেও একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন না। একজনের জন্ম চুরুলিয়ায়, অপরজন বড় হলেন মাতামহের কাছে অণ্ডালে। একজন পড়তেন রানীগঞ্জ স্কুলে, অপরজন শিয়ারশোল রাজার স্কুলে বিনা বেতনে তো বটেই এবং গরীব ও মেধাবী হওয়ার কারণে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেয়ে। একজনের আয়ের অভাব নেই, অপরজন বিত্তহীন। মাসিক সাত টাকাও দরিদ্র বিধবা মায়ের সংসারে চলে যেত। ছোট ভাই আলি

হোসেন ঠিক সময়মত আসতো আর অকাতরে নজরুল তার ভায়ের হাতে তুলে দিত গোটা মাসের বরাদ্ধ– বৃত্তির টাকা। এর ফলেই নজরুলকে কখনও কখনও পড়া ফাঁকি দিয়ে হতে হয়েছে রুটির দোকানে খানসামা, কখনও কোন এক রেলের গার্ড সাহেবের বাবুর্চি। 'দুখু মিয়া' নাম তাঁর সার্থক। কিন্তু স্কুলে ফিরলেই প্রথম। মেধায় কোন দীনতা ছিলনা। কিন্তু একটি জায়গায় নজরুল ও শৈলাজনান্দ দুজনই ছিলেন অনন্য, মানিকজোড়। চিত্ত, মনন এবং হৃদয়ের ভালবাসায় দুজনের কেউই কখনও দরিদ্র ছিলেন না। সমগ্র আসানসোল, রানীগঞ্জ, শিয়ারশোলে তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল সর্বজন বিদিত।

সমকালীন হিন্দুসমাজঃ

শৈলজানন্দ হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কখনও তাঁকে স্পর্শ করেনি। বোধকরি এজন্য নজরুল সৈনিক জীবন থেকে কলকাতায় ফিরে এলে শৈলজানন্দ তাঁর হোস্টেলে তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন। নজরুলের জন্য 'গেস্টচার্জ' দিতে হতো তাঁকে। কিন্তু এই থাকা খাওয়া নিয়ে সেদিন যে গোল বেঁধেছিল এবং এক শ্রেণী হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যে দারুণ বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল– তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন শৈলজানন্দন।

".....সেই দিনই একটা কাণ্ড ঘটল। নীচে ছিল খাবার ঘর। আমরা নীচে না গিয়ে খাবারটা ওপরের ঘরে আনিয়ে নিতাম। খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে গল্প করছি, হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করো না। বললাম, বলুন। তিনি বললেন, তোমার এই বন্ধুটি কতদিন থাকবেন এখানে? – কেন বলুন তো? কথাটা বলতে বোধ করি তিনি সংকোচ বোধ করছিলেন। বললেন, এখানেও তো তোমাকে গেস্টচার্জ দিতে হবে, তার চেয়ে ওঁকে যদি বাইরে কোন হোটেলে খাইয়ে আনো তাহলে বোধ হয় তোমার খরচ কম পড়বে, ওঁর খাওয়াটাও ভাল হবে। বলবার উদ্দেশ্য কিছুটা বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, মুসলমান বলে কি কোন কথা উঠেছে? তিনি বললেন, না তেমন কিছু না। চাকরটা শুনেছে উনি মুসলমান। তাই ওঁর এঁটো বাসন ধুতে চাচ্ছে না।

আমি ধুয়ে দিচ্ছি। বলে চলে এলাম ওঁর ঘর থেকে। আমাদের ঘরে এসে দেখলাম আমাদের দুজনের এঁটো বাসন তখনও তোলা হয়নি। বিনোদ চলে গেছে ক্লাস করতে। নজরুল একা একটা সিটের উপর ফিরে শুয়ে আছে। বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনও শব্দ না করে চুপিচুপি জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললাম।

দুপুরে ঘন্টা দুইয়ের জন্য আমাদের ক্লাস বসত। জামাটা গায়ে দিয়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে নীচে নেমে যাবার আগে বললাম, ঘুমোলে নাকি? আমি ক্লাসে যাচ্ছি। চোখ বুঁজে তেমনি শুয়ে শুয়েই নজরুল বললে, যাও। ক্লাসে সেদিন কোনও কাজই করতে পারলাম না। ঠিক করলাম নজরুলকে নিয়ে আমিও আজ চলে যাব এখান থেকে। কুড়ি নম্বর বাদুড় বাগান রো-তে (আজকাল এক নম্বর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট) রায় সাহেব

বাড়ী কিনেছেন একখানা। বাড়ীটা খালিই পড়ে আছে। নীচের একখানা ঘরে মাত্র একজন দারোয়ান থাকে। সেইখানে গিয়ে উঠব।

ক্লাসের ছুটির পর ওপরের ঘরে গিয়ে দেখি, নজরুল তাঁর জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে বসে আছে। যা ভয় করছিলাম তাই হয়েছে। নজরুল নিশ্চয়ই ঘুমায়নি, জেগে জেগে দেখেছে– আমি তার এঁটো থালা বাটি তুলে নিয়ে গেছি। ভালই হয়েছে। বললাম, দাঁড়াও আমার বিছানাটা বেঁধে নিই। দুজনে বাদুড় বাগানের বাড়ীতে গিয়ে উঠব। নজরুল বললে, না। দুজনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি পরে একদিন যেও। আমি আজ কলেজ স্ট্রিটে যাই। বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ সাহেব মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন নজরুলকে। তিনি যেন তারই প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন।"

শৈলজানন্দ হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হলেও, সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। নজরুলের প্রতি ভালবাসা এতদূর ছিল, যে তিনি তাঁর এঁটো থালা বাটি নিজ হাতে ধুয়ে ছিলেন। এই গ্রন্থে অনেক স্থানেই তাঁর অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের পরিচয় রয়েছে।

নজরুলের প্রতি শৈলজানন্দের ভালবাসা খুব ছেলেবেলা থেকেই গভীর ছিল। তাঁদের উভয়ের বন্ধুত্বের একটি ঘটনা–

শৈলজানন্দ পুকুরে স্নান করতে ভালবাসতেন। ঝাঁপিয়ে, সাঁতার কেটে চোখ লাল করে বাড়ী ফিরবেন এমনটা। নজরুল ওদিকে ঠিক তাঁর উল্টো। পাতকুয়া থেকে পানি তুলে তবে গোসল। কারণ নজরুল সাঁতার জানতেন না। বেশ, এবার শৈলজানন্দ নজরুলকে নিয়ে গেলেন পুকুরে। একটু একটু করে শেখাতে শেখাতে ডুব পানিতে এসে ভয়ে নজরুল শৈলজানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনেই ডুবে মরতেন যদি শৈলজানন্দের মাতামহ রায় সাহেবের কোচওয়ান মাহবুব সে সময় পুকুরে না থাকতো। এরপর নজরুলও সাঁতার শিখেছিলেন এবং দুই বন্ধু প্রাণভরে একসঙ্গে সাঁতার কেটেছেন।

নজরুলের কাব্য এবং গল্প লেখা জীবনেরও সাক্ষী শৈলজানন্দ। স্কুলে থাকতেই দুজনে কবিতা গল্প লিখেছেন। শৈলজানন্দ তখন লিখতেন কবিতা, নজরুল লিখতেন গল্প। কিন্তু গল্পের চেয়ে কবিতাতেই তার হাত ছিল ভাল। এই লেখার জন্য তাঁর স্কুল কামাই। অথচ, লেখা পড়ায় নজরুল ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। প্রথম তো বটেই, এমনকি ডবল প্রমোশনও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যট্রিকুলেশন পাশ করা হল না তাঁর। হঠাৎ সৈনিক জীবন বেছে নেওয়ায় এমন হ'ল। দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসা কাল হ'ল।

ছেলেবেলা : ইংরেজ বিদ্বেষী নজরুলঃ

নজরুল বাল্যকাল থেকেই অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। কৈশোরেই প্রথম কবিতা লেখেন। স্কুলজীবনে অনেক কবিতা লিখেছিলেন সে- সবের মধ্যে দুই একটা কবিতা শৈলজানন্দ মনে রেখেছিলেন। এসবের পেছনে নানা ঘটনা ছিল। শৈলজানন্দ এবং নজরুলের একজন বড়লোক বন্ধু ছিল–সবাই তাকে পঞ্চলাট বলতো। একটা এয়ারগান কিনে পাখি মারতে চেষ্টা করেও পারেনি সে। নজরুল এয়ারগান চালাতে চেয়েছিলেন পাখি মারার জন্য নয়, ইংরেজদের মারবেন বলে। সেই ছেলে বেলায় তিনি ইংরেজ বিদ্বেষী হয়েছিলেন দেশের জন্য। এর একটা চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন শৈলজানন্দ তাঁর গ্রন্থে।

নজরুল এবং শৈলজানন্দের সে সময়ের বন্ধু ছিল পঞ্চ নামের এক ধনী ছেলে। তার বড়লোকী ভাব দেখানোর জন্য সকলে তাকে বলতো পঞ্চলাট। এই পঞ্চলাট এয়ারগান কিনে পাখি মারতে ব্যর্থ হয়ে সেটা নজরুলের অজান্তে তাঁর ঘরে রেখে গিয়েছিল। বন্দুক পেয়েতো নজরুল খুব খুশী। স্কুল থেকে ফিরে দুই বন্ধু বন্দুক নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। শৈলজানন্দের লেখায় এর বর্ণনা রয়েছে–

"বন্দুক নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। গেলাম নির্জন কবরখানায়। শহরের একদিকে ক্রিশ্চানদের কবরখানা। ওর ত্রিসীমানায় লোকজন কেউ হাঁটে না। গাছও যত পাখিও তত। বন্দুকটা নজরুলের হাতে দিয়ে বললাম, মার এইবার যত পার। কেমন করে চালাতে হয় শিখিয়ে দেবার প্রয়োজন হল না।

কিন্তু পাখি সে কিছুতেই মারবে না। গোরস্থানের একদিকে সারি সারি কয়েকটি ইট বাঁধানো বেদীই তাঁর লক্ষ্য। তার ভেতর একটি বেদী হল বড়লাট, একটি হল ছোটলাট, একটি হল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর একটি হল এসডিও। তারপর একের পর এক চলতে লাগলো তাদের উপর আক্রমণ। ইট দিয়ে বাঁধানো চুনকাম করা বড় বড় বেদী। বেশী দূরেও নয়, মারতে গেলে পাখির মত উড়ে পালায় না। কাজেই হাতের টিপের বিশেষ প্রয়োজন হল না। গোল গোল সিসের গুলি এয়ারগানের নলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে ফটাস ফটাস করে লাগল গিয়ে দেশের শত্রু ইংরেজদের গায়ে। একটা গুলি লাগে, আর নজরুলের সে কী উল্লাস! নজরুলকে তখন বলেছিলাম, আমার এখনও মনে আছে–ওরা কী দোষ করলে বল তো? বড়লাট, ছোটলাট–ওরা তো চাকরী করে, ওরা কর্মচারী। নজরুল বলেছিল, না ওরা ইংরেজের প্রতিনিধি। ইংরেজ মানেই আমাদের শত্রু। ওরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাক।

– নইলে তুমি ওদের মেরে তাড়াবে? – চেষ্টা করব। প্রাণের ভয়ে কেউ এ দেশে আসতে চাইবে না। এমনি করে পঞ্চুর এয়ারগান নিয়ে চলতে লাগলো আমাদের।"

তারপর বাঙ্গালী পল্টন তৈরী হলে নজরুল এবং শৈলজানন্দ সৈনিকে ভর্তি হবার দরখাস্ত করেন। নজরুল সুযোগ পান। শৈলজানন্দ যেতে পারেন না। তাঁর মাতামহ রায় সাহেব কৌশল করে তাঁকে যুদ্ধে যেতে দেননি।

কবিতার জন্মঃ নজরুল ও চড়ুইপাখি :

স্কুলে পড়ার সময়ই নজরুলে কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। কিভাবে নজরুল কবিতা লিখলেন তারও চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন শৈলজানন্দ।

"একটা দালানের কড়িকাঠের ফাঁকে বাসা বেঁধেছিল একটা চড়ুই পাখি। তারই একটা ছোট বাচ্চা একদিন উড়তে গিয়ে পড়ে গেল নিচে। আহা, বেচারা! উড়ে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, খানিকটা গিয়েই আবার বসে পড়ল। সবে তখন সে উড়তে শিখেছে। আমরা যে ক'জন ছিলাম সেখানে, তখন কতই বা আমাদের বয়স! আমরাও তখন ছোট। যে পাখি ধরা দেয় না, ধরতে গেলে উড়ে পালায়, সেই পাখি নিজে এসে ধরা দিয়েছে। এইতেই আনন্দ।

আমাদেরই ভেতর একজন ছুটে গিয়ে পাখিটিকে ধরে আনল। একজন আনল লম্বা খানিকটা সুতো। সুতো বাঁধা হল পাখিটার পায়ে। তারপর চলতে লাগলো খেলা। পাখিটা চেষ্টা করছে উড়ে পালাবার। বেশিদুর যেতে পারছে না। পায়ে টান পড়তেই বসে পড়ছে। ওদিকে মাথার উপরে পাখিদের জগতে তখন হুলুস্থুল পড়ে গেছে। মা পাখিটা চিৎকার করছে। উড়ে উড়ে একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসছে। ভাষা বুঝিনা, তবু মনে হচ্ছে–কী যেন সে বলছে আমাদের। আরো অনেকগুলো চড়ুই পাখি ছুটছে তার সঙ্গে। নজরুল বললে, ওকে ছেড়ে দাও!–হ্যাঁ, ছেড়ে দি আর কাগে ঠুকরে ঠুকরে ওকে মেরে ফেলুক। কে যেনো বললে, ওকে ওইখানে তুলে দাও!–বেশ বলেছ ! তুলে দি, আবার পড়ে যাক। এবার পড়লে ও মরে যাবে কিন্তু। তাছাড়া কড়ি কাঠ অনেক উঁচুতে। নাগাল পাওয়া মুশকিল। নজরুল কখন বেরিয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। খানিক পরে দেখি সে একটি মই কাঁধে নিয়ে ফিরে আসছে। পাখিটা তখন আর উড়ছে না। এক জায়গায় বসে বসে থর্ থর্ করে কাঁপছে। ভয়ে বোধ হয় আধমরা হয়ে গেছে। সেই আধমরা পাখির বাচ্চাটিকে তুলে দেওয়া হল তার মায়ের কাছে। নজরুলই তুলে দিলে। ভালো কাজের একটা মজা আছে। যখন কেউ করে না তো করে না, আবার যখন কেউ করে, তখন মানুষের মাথা সেখানে আপনা থেকেই হেঁট হয়ে যায়। আমার খুব ভাল লাগলো। সেই দিনই রাত্রে আমি একটা কবিতা লিখে ফেললাম। নজরুলকে শোনাতে গিয়ে দেখি, সে-ও লিখেছে একটা কবিতা। কবিতা লেখেনি, লিখেছে কথিকা। আজকালকার দিন হলে হয়ত বলতাম গদ্য কবিতা।"

এরপর দিন যায়। একদিন শৈলজানন্দ নজরুলের বোর্ডিং এ গেলেন। দেখলেন নজরুল বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কী যেন লিখছে। লেখা শেষে নজরুল তা তার বন্ধুর হাতে তুলে দিল। শৈলজানন্দ দেখলেন সেদিনের সেই চড়ুই পাখিটিকে নিয়েই কবিতা লিখেছে নজরুল। নিচে কবিতাটি দেওয়া হল –

মস্ত বড় দালান বাড়ির উঁই লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট্ট একটা চড়াইছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।
'চু চা' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে
মায়ের পরাণ-ভাবলে বুঝি দুষ্ট ছেলে নিচ্ছে ছায়ে।
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটল মাতা ফড়িং মুখে
স্নেহের আকুল আশীষ-জোয়ার উথলে ওঠে মার সে বুকে!
আধ ফুরফুরে ছা-টি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমিই যাই না ছুটে বসিগে মার বক্ষ জুড়ে।
হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে উড়তে গেল অবোধ পাখি
ঝুপ করে সে গেল পড়ে– ঝরল মায়ের করুণ আঁখি!
হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠল কেঁপে
রাখলে নাকো প্রাণের মায়া বসলো ডানায় ছা-টি চেপে।
ধরতে ছুটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে
ছুটছে পাখি প্রাণের ভয়ে ছোট দুটি ডানা তুলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন
বুঝেনা কেউ স্কুলের ছেলে– মায়ের সে যে বুক ভরা ধন।
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে দেখছে আঁসু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ
তবুগো তার মরম ছিঁড়ে উঠলো বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে
ছানার দুটি সজল আঁখি, করলে আশীষ পরাণ খুলে।
অবাক-নয়ান মা-টি তাহার রইল চেয়ে পাঁচুর পানে
হৃদয় ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখির মায়ের নীরব আশীষ যে ধারাটি দিল ঢেলে
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্ব মাতার বিশ্ব মিলে!

কবিতাটি নজরুলের কোন কাব্যসম্ভারে দেখিনি। শৈলজানন্দ আমৃত্যু কবিতটি নিজের সংগ্রহে রেখেছিলেন। ৪২ বৎসর আগে লেখা এই কবিতাটি তিনি সযত্নে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলেন। 'কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে' গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় শৈলজানন্দ লিখলেন–

"আজ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে লেখা এই কবিতাটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এমনি আরও কিছু বাল্যের স্মৃতিচিহ্ন ছিল আমার কাছে। কিছু তার আছে কিছু হারিয়েছে। এখন শুধু মনে মনে ভাবি– অনেক মূল্যবান বস্তুই তো হারিয়েছি, কোন

কিছু সঞ্চয় করে রাখা ধর্মই আমার নয়, তবু এমন কি মূল্য আমি এর মধ্যে পেয়েছিলাম, যার জন্য যক্ষের ধনের মত কয়েক টুকরো কাগজ আমি আগলে রেখেছি।"

শৈলজানন্দ নজরুলের সে সময়ের আরও কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে 'রাণীর গড়' নামে আর একটি কবিতা ছিল। শৈলজানন্দ ও নজরুল যে অঞ্চলের মানুষ সেখানকার ইতিহাস ঐতিহ্য ধরা পড়েছে নজরুলের লেখায়। সেই রাণীর প্রতিও ছিল তাঁর অসাধারণ মমত্ববোধ–

ওই– ঝাউ এর পাহাড়ে নীরব চিতাটি রাণীমার।
ও যে– দপ্ দপ্ জ্বলে, লোকে বলে আলো আলেয়ার।
এই নিভে যায় এই জ্বলে ওঠে
থমকি চমকি পিছু দিকে ছোটে,
মিশে যায় শেষে, রাজ গড়ে উঠে
আবার তেমনি আঁধিয়ার।
ওই শোনা যায় দু-পহর রাতে
ঝটিকার মুখে হাহাকার।
ওগো রাণীমার– আহা রাণীমার!
ওই ঝাউ পাহাড়ে
নীরব চিতাটি রাণীমার।

কৈশোরে দেশপ্রেম: সৈনিক হবার স্বপ্ন

কবিতা দুটি নজরুলের অল্প বয়সের লেখা। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় কবিতায় তার অসাধারণ হাত এসে গিয়েছিল সে সময়ে। এই বয়সে এত পরিপক্ক কবিতা লেখা অনেকটাই অসম্ভব। নজরুল স্বভাবকবি শুধু নয়, কবিতার নানা রকম-ফের তাঁর অজানা ছিলনা। মেধাবী হওয়ার ফলেই সেটা হয়েছে, যেমনটি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বেলায়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন, নজরুলের আর্থিক দীনতার কারণে পাশ্চত্য সাহিত্য সম্পর্কে জানবার তাঁর তেমন সুযোগ ছিল না। যেটুকু জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন তা পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পাঠ করেই। নজরুল স্বপ্নাবিষ্ট কবি ছিলেন না। যেমনটি ছিলেন ইংরেজ কবি কেডমন যিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে অসাধারণ ধর্মীয় কবিতা লিখেছেন। নজরুলের 'চড়ুই' এবং 'রাণীর গড়' নিয়ে কবিতা পড়ে বুঝলাম, ওই বয়সে তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা অনেকটাই পেখম মেলেছে। কবিতার ভিতরে একটা বেদনার সুর যেন ফল্গুধারার মত প্রবহমান। শৈলজানন্দ তাঁর গ্রন্থে নজরুলের সৈনিক হয়ে যাবার ইচ্ছেটাও গল্পচ্ছলে ব্যক্ত করেছেন। নজরুলের আগে যারা সৈনিক হলেন এবং ট্রেনে করে তাদের গন্তব্য স্থলে গেলেন তখন নজরুলের মধ্যে অসাধারণ দেশপ্রেম কাজ করছিল এবং তিনি 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে ট্রেনের সৈনিক যাত্রীদের অভিনন্দন জানালেন। 'বন্দেমাতরম' তখন হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক ছিল।

'বন্দেমাতরম' বলতে ভারতমাতাকে বোঝাতো। ভারতমাতা ছিলেন হিন্দুদের মাতৃদেবী Mother Goddess. দূর্গা, কালী দেবী ছিলেন এই Mother Goddess এর প্রতীক। বসুন্ধরা বা পৃথিবীকেও তারা মাতৃদেবী Mother Goddess হিসেবে গ্রহণ করেছিল। নজরুল যে পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। নিজের পরিবারে ইসলামী শিক্ষা যেটুকু পেয়েছিলেন পরবর্তিতে তা তাঁর জীবনে কিছু প্রভাব ফেললেও তাঁকে সাম্প্রদায়িক করে তোলেনি।

আগেই বলেছি শৈলজানন্দ লিখিত গ্রন্থে নজরুলের শৈশব কৈশোরের চমৎকার বিবরণ রয়েছে। সৈনিকের চাকুরী থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কলকাতায় শৈলজানন্দের সঙ্গে থেকেছেন এবং সেখানে তাঁর সাথে থাকতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরকার যে দ্বন্দ্ব– তা একজন পাচককেও প্রভাবিত করেছিল। নজরুল সেদিন অন্তরে ব্যথা পেয়েছিলেন বিধায় শৈলজানন্দের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে চাননি। শৈলজানন্দ নিজে অসম্প্রদায়িক ছিলেন কিন্তু তাঁর সমাজ নজরুলের মুসলমান হওয়াটাকে ভিন্ন চোখে দেখেছে। এমনিভাবে আমরা লক্ষ্য করি কল্লোল যুগের প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের মধ্যেও অসম্প্রদায়িক চেতনা শতভাগ কাজ করলেও সেদিনকার হিন্দু সমাজ নজরুলের মুসলমানিত্বকে মেনে নিতে পারে নি। নজরুলের মধ্যে যে আদৌ সাম্প্রদায়িকতা ছিল না একথা শৈলজানন্দ তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করেছেন। শৈলজানন্দের গ্রন্থটি পুরোপুরি নজরুলকে নিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ স্মৃতিচারণ মূলক লেখা নয়। এখানে তিনি গল্পচ্ছলে অনেক বিষয় নিয়ে এসেছেন তিনি এবং তার মধ্যে কখনও কখনও নজরুল প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে মানতে হয় যে এই গ্রন্থে নজরুলের সে সময়কার জীবনাচরণ, গানের দলের পিছনে ছুটে বেড়ানো, বেঁচে থাকার জন্য নানা বৃত্তি গ্রহণ ইত্যাদির পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশের বিষয়টিও চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। শৈলজানন্দ নিজেও একজন বড়মাপের গল্প লেখক ছিলেন বিধায় তাদের উভয়ের বন্ধুত্বের ছবি অসাধারণভাবে চিত্রিত হয়েছে।

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'নজরুল স্মৃতি' সংকলনের ভেতর শৈলজানন্দ লিখিত 'মানুষ নজরুল' নিবন্ধে আবার দুই বন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও শৈলজানন্দ নজরুলের অসাধারণ মনের পরিচয় তুলে ধরেছেন ছোট-খাট কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে। নজরুল দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছিলেন। কিন্তু দরিদ্রসুলভ আচরণ তাঁর মধ্যে কখনও ছিল না। মটরকারে চড়বার তাঁর যে দারুণ সখ ছিল তারও উল্লেখ রয়েছে এই নিবন্ধে। নজরুলের অতুলনীয় প্রতিভার কথা বারংবার ব্যক্ত করেছেন তিনি যেখানেই সুযোগ এসেছে। কিন্তু তার হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়াটা তাঁর কোন বন্ধুই যে সহ্য করতে পারেননি এমনকি কৈশোরের বন্ধু ছিনু, শৈলেন, যতিন কেউই নয়– একথা ফিরে ফিরে এসেছে 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গ্রন্থে এবং 'মানুষ নজরুল' নিবন্ধে।

অবিস্মরণীয় চরিত্রঃ ছিনু

"কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে" গ্রন্থে নজরুলের যে স্মৃতিচারণ শৈলজানন্দ করেছেন তা এক কথায় অভিনব। পড়তে পড়তে চোখ যে কখন সিক্ত হয়ে ওঠে, পাঠক মাত্রই তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

বলতে কি, এই গ্রন্থে শৈলজানন্দ নজরুল জীবনের নানা দুঃখ-শোকের বর্ণনা দিয়েছেন গভীর মমতায়। তাঁর নিজের কথাও উঠে এসেছে। হিন্দু সমাজের কথাও তিনি বলেছেন। গল্পচ্ছলে মুসলমানদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি অসমর্থন জানিয়েছেন এবং এটা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছেন, নজরুল এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। জীবন দিয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করে তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তা আজও অপূর্ণই থেকে গেছে।

সেই কৈশোরে নজরুলের সাথে যাঁরা থাকতেন, তাদের একজনের নাম ছিল ছিনু। নজরুল যে বোর্ডিং-এ থাকতেন সেখানে ছিনু থাকতো ছাত্র হিসেবে। কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে রান্না-বান্নার কাজেই বেশী ব্যস্ত থাকতো সে। তবে নজরুলকে ভালবাসতো প্রাণ দিয়ে। নজরুল গরীব ঘরের ছেলে। মেধাবী। সে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে মা-বাবার দুঃখ ঘোচাবে, এটা সে চাইতো। নিজের জন্য তার তেমন চিন্তা ছিলনা। নজরুলের কাপড় কাচা, ঘর গোছানো সব যেন ছিল তার দায়। নজরুলের এই বোর্ডিং-এ শৈলজানন্দ প্রায়ই অসতেন। এখানেই ছিনুর সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং বন্ধুত্ব। ছিনু জানতো শৈজানন্দের সঙ্গেই নজরুলের ভাব বেশী। ছিনু নজরুলের উপর খবরদারি করতো। কিন্তু নজরুল তাতে কোনদিন অসন্তুষ্ট হননি। শৈলজানন্দ তাঁর এই গ্রন্থে নজরুলের পাশাপাশি ছিনুকেও অমর করে রেখেছেন।

ছিনু প্রায়ই দেখতো নজরুল রাত জেগে কী সব লেখে। তারপর শৈলজানন্দ এলে খুব মজা করে সে সব পড়ে শোনায় এবং খুব হাসাহাসি করে। কিন্তু গোল বাঁধল যখন সে দেখলে নজরুল স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। ছিনু মনে করল শৈলজানন্দ উস্কিয়ে দেবার কারণে নজরুল লেখালিখি করে। স্কুলে যায় না। এতে সে শৈলজানন্দের উপর ক্ষেপে গেল। নজরুলের সঙ্গেও তার রাগারাগি। কথা বন্ধ। এর মধ্যে শৈলজানন্দ এলেন নজরুলের বোর্ডিং-এ। ছিনু তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে নজরুলের সঙ্গে তার কথা বন্ধের কথা জানাল। শৈলজানন্দ হেসে উড়িয়ে দিলেন তার কথা। বললেন, এ ঝগড়া প্রেমের ঝগড়া। এক্ষুনি ভাব হয়ে যাবে। শৈলজানন্দ ভারী চমৎকার ভাবে সে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন–

"ছিনু বোধ করি রাগ করলে আমার কথা শুনে। বললে, তুমি তো তা বলবেই। তুমিই হচ্ছ যত নষ্টের গোড়া। তুমিই তো এইটি করলে!

.....ছিনুর রাগ আমি কখনও দেখিনি। ডাঁট ভাঙা একটা কাপে ফুঁ দিয়ে চা খাচ্ছিল ছিনু। কাপটা ঠক্ করে নামিয়ে দিয়ে সে যেন লাফিয়ে উঠল। বললে এ

বিদ্যে ওকে কে শেখালে? এই যে আজ চারদিন ধরে দিনরাত মুখ গুজে পড়ে আছে, নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, এসব কী বলতে পারো? বেলা দুটোর সময় হুকুম হল– ছিনু চা দে। তাই দিলাম। গরম চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। মুখে দিলেনা। বলতে গেলাম তো বললে আবার গরম করে দে। দিলাম গরম করে। ব্যস, তাও খেলেনা। না খেলি, তো না খেলি! বললাম, চা টা তো আবার ঠান্ডা হয়ে গেল। বাবু মেজাজ দেখিয়ে বললে, যাকগে, তোর কী? আমার কি আমার বয়ে গেল! এই চায়ের পাঠ দিলাম তুলে এবার কি খাবি খা! বলেই সে ঘটির জলটা উনোনে ঢালতে যাচ্ছিল। ঘটিটা কেড়ে নিলাম তার হাত থেকে। বললে, আসল কথাটাই বলিনি, এখন শোন। পাঁচ পয়সার কেরোসিন তেল কিনি, দুদিন-তিনদিন চলে। কাল বিকেলে তেল কিনে লণ্ঠন ভর্তি করে দিয়েছি, আর আজ সকালে দেখি কিনা– লণ্ঠন একেবারে শুকনো ঠন্‌ঠন্‌ করছে। বুঝতেই পারছো বাবু কাল সারারাত ধরে পদ্য লিখেছে। অপরাধের মধ্যে লণ্ঠন দেখিয়ে বলতে গেলাম– বলি ইস্কুলের পড়া তো কোনদিন এমন করে পড়তে দেখিনি, এক রাতেই এক লণ্ঠন তেল খতম! তা সে কি করলে জানো? তেড়ে আমাকে মারতে এল। লণ্ঠনটা দিলে আমার গায়ে ছুঁড়ে! কাঁচটা ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল!

বিশ্বাস হলোনা। বললাম, সে রকম রাগ তো আমি ওর কোনদিন দেখিনি, ছিনু। তুমি তেলের কথা বললে আর নজরুল ছুঁড়ে দিল লণ্ঠনটা? ছিনুর মুখখানা এবার অন্যরকম হয়ে গেল। বললে, এই দেখ তুমি আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করলে! আমি কি মিছে কথা বলছি?

বললাম, না না, আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছি, তুমি নিশ্চয়ই ওকে বিরক্ত করেছিলে। এবার হেসে ফেললে। ফিক্ করে হেসে বললে, তা করেছিলাম। চুল ধরে দুবার টানও দিয়েছিলাম, আর ওই যাতে লিখছে, ওই খাতাটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

বললাম, তাহলে বেশ করেছে। ছিনু বললে, বেশ করেছে ?

–লণ্ঠনের কাঁচটা ভেঙে দিয়েছে, বেশ করেছে? আমি কিন্তু কাঁচ আর আনছি না! থাক্ ও অন্ধকারে, লিখুক কেমন করে লিখবে।

.....মাসের শেষ, পয়সা গুলো সব শেষ করেছে, হাতে একটি পয়সা নেই। এইবার ওর স্কুলের বইগুলি আমি একটি একটি করে বেচে দেব।

বললাম কেন? বই বেচবে কেন?

ছিনু বললে, কী হবে বইগুলো! ইস্কুলের বইতো ও ছোঁয় না!

বললাম, ছোঁবে ছোঁবে। রাগ করছো কেন ?

–রাগ করব না ? ছিনু বললে, দ্যাখো মিঞা সাহেব, দুখু মিয়ার ঘরে ভাত নাই, গরীবের ছেলে, ওর বাড়ীতে যে কী কষ্ট তা আমি জানি। কোন রকম লেখা পড়া একটু যদি শিখতে পারে। তাহলে কয়লা খাঁদে যেমন হোক একটা চাকরী জুটবে। ওর কি এই রকম করা সাজে ?

কী আর বলব, চুপ করে রইলাম.....

.....ছিনু বললে, তুমি যদি দিন কতক আসা বন্ধ করো তো ওর লেখা আমি বন্ধ করে দিই! বুঝলাম, সব কিছুর জন্য দায়ী করছে ছিনু।

স্কলারশিপ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়। আর এই লেখার নেশায় মেতে যদি স্কুল যাওয়া বন্ধ করে তো আর কেউ কিচ্ছু না বলুক, ছিনু আমাকে বলতে ছাড়বেনা।

বললাম, বেশ যাবনা।

নজরুলের মঙ্গল কামনায় বলি নি। তার কবিতা লেখা বন্ধ হোক ভেবেও নয়। আজও আমার বেশ মনে আছে– বলেছিলাম ছিনুর উপর রাগ করে।"

চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন শৈলজানন্দ একেবারে একজন অতি সাধারণ নজরুলবন্ধু ছিনুকে নিয়ে। কিন্তু গল্পের শেষ তো এখানে নয়। শৈলজানন্দ সত্যি সত্যি নজরুলের ওখানে দীর্ঘদিন যাননি অভিমান করে। মামার বাড়ি গিয়ে জ্বর বাঁধিয়ে থেকেছেন বেশ কিছুদিন। নজরুলকে চিঠি লিখতে যেয়েও চিঠি লেখেননি।

এরপর রানীগঞ্জে ফিরে এসে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পথে শুনলেন নজরুল স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। শৈলজানন্দ এবং নজরুলের এক বন্ধু ছিল সতীশ। তার কাছ থেকে শৈলজানন্দ শুনলেন, নজরুল গাঁজা খায়।

শৈলজানন্দ প্রতিবাদ করলেন, বললেন, "নজরুল কোনোদিন ছোঁয়নি ওসব।

.....

সতীশ বললে, গাঁজা না টানলে ওই রকম কবিতা লিখতে পারে কেউ?"

এরপর সতীশ এর কাছ থেকে শৈলজানন্দ জানতে পারলেন নজরুল একটা দোকান থেকে গাঁজা কেনেন। শৈলজানন্দ রেগে গেলেন। নজরুলের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটার ফয়সালা করতে হবে। ফয়সালা হয়েছিল। নজরুল গাঁজা কিনতেন নিজের জন্য নয়। একজন ফকির মাস্তানের জন্য। যার ওপর একদিন তিনি কবিতা লিখেছিলেন। 'মুক্তি' নামে ধর্মীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ তা ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই কবিতাতেই সেই ফকিরের কথা আছে।

এরপরে ছিনুর প্রসঙ্গ আবার এসে পড়ে। দীর্ঘদিন পরে নজরুলের সঙ্গে দেখা হতেই শৈলজানন্দকে নজরুল বললেন,'বেশ ছেলে বাবা! ছিনু কি বলেছে না বলেছে আর ওমনি রাগ হয়ে গেল? ছিনু! ছিনু!

বাইরে থেকে ছিনুর জবাব এল, শুনেছি। শুনেছি।.....

ছিনুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বকুনি খাচ্ছিলে কেন?

–তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম যে।.....

বললাম, তাও তুমি বলেছ নজরুলকে?

–বলব না? মরছিল যে তোমার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে। আমাকে বলেছিল তুই যা একবার রায় সাহেবের বাড়ি। আমাকে দেখলে চাকরগুলো ভাল করে কথা বলে না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তুমি অণ্ডালে গিয়েছিলে মিঞা সাহেব?

বললাম, হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম। ছিনু বললে ওই শোন। আর দুখু আমাকে বলে কিনা আমি তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি।.....

নজরুল তাঁর বালিসের তলা থেকে খাতাটা টেনে বের করল। বললে, দুটো বড় কবিতা শেষ করেছি শোন। একটা "রাজার গড়" আর একটা "রাণীর গড়"।

দুটি কবিতা শুনলাম। শুনে বলেছিলাম, তুমি আর গদ্য লিখবে না। এখন থেকে কবিতাই লিখবে। ছিনু যে ঘাপটি মেরে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল বুঝতে পারি নি। তার সে হুঁকোটি হাতে নিয়ে কোলকেয় ফুঁ দিতে দিতে এসে দাঁড়াল। বললে, সাধে কি তোমাকে আসতে বারণ করি মিঞা সাহেব! ওই মন্তরটি দিলে ওর কানে! আবার বললে তো লিখতে। নজরবল বলে উঠলো, ছিনু! তুই না বলেছিলি আর বলবি না!....."

ছিনু নামের এই বাল্য বন্ধুর কি যে ভালবাসা ছিলো নজরুলের প্রতি, শৈলজানন্দ তার বর্ণনা দিয়েছেন। মনে হয়েছে সব যেন জীবন্ত। আমার লেখাটা দীর্ঘ হল ঠিকই। কিন্তু এই ছিনুর কথা তো নজরুল প্রেমিক বা ভক্তদের অনেকেই জানেন না। সেজন্য এখানে সামান্য বর্ণনা দিলাম। শৈলজানন্দ লিখেছেন এরপর তাদের আর ছিনুর সাথে দেখা হয় নি। ছিনু চলে গেছে। তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। নজরুল সৈনিক হয়েছেন। ফিরে এসেছেন দেশে। বড় কবি হয়েছেন। দেশজুড়ে নাম হয়েছে। তারপর হঠাৎ নজরুল স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শৈলজানন্দ তাকে দেখেছেন। নজরুল তাকে চিনতে পারেননি, কথাও বলতে পারেননি। দুজনার এতো বন্ধুত্ব সব যেন শেষ হয়ে গেল। ঠিক এমনই মুহূর্তে শৈলজানন্দের সঙ্গে আবার ছিনুর দেখা হয়েছিল। গরীব ও দুঃখী। বৃদ্ধ হয়ে গেছে সেও। আসানসোল ষ্টেশনে দেখা হয়েছিল ছিনুর সঙ্গে। শৈলজানন্দকে দেখে দীর্ঘ বছর পর আবার সে জানতে চেয়েছিল নজরুল সম্পর্কে। নজরুলের স্তব্ধতার কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল নজরুল বন্ধু ছিনু। তার দুঃখের সীমা ছিল না। ছিনুর জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন শৈলজানন্দ তাঁর গ্রন্থে। পড়তে পড়তে চোখ ভিজে আসে। নজরুল কোন গ্রন্থে ছিনুর কথা কোথাও লেখেননি। কিন্তু শৈলজানন্দ লিখলেন। ছিনু অমর হল তাঁর লেখায়।

এমনি আরও একটি ঘটনা: দুগ্‌গার গল্প

নজরুল চিরকাল ভালবাসা ও স্নেহের কাঙ্গাল ছিলেন। শৈলজানন্দ তাঁর 'কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে' গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন।

এবারে নজরুলের ইংরেজি শিখবার প্রচেষ্টার কথা বলি:

গল্পটি একজন ইংরেজ সাহেব ও বাঙ্গালী পরিবারকে নিয়ে। শৈলজানন্দ ও নজরুল দু'জনে ইংরেজি শিখবেন। এর আগের গল্প আছে, সেটা আর বললাম না। এখানে তার

পরের গল্পটি সংক্ষিপ্তাকারে বলছি। একজন ইংরেজ সাহেব তখন রাণীগঞ্জে থাকেন। নাম শেকার। তাঁর স্ত্রী বাঙ্গালী। কিন্তু প্রচণ্ড রকম কালো। তাদের গর্ভে একটি মেয়ে সন্তান। 'চমৎকার গড়ন এবং দেখতে ফর্সা। এই গল্পের প্রধান চরিত্র একটি দরিদ্র ছেলে, যার খাওয়াও জোটেনা প্রতিদিন। নাম দুগ্‌গা, ভালো নাম দুর্গা। কিন্তু দারিদ্র্য এবং করুণার ভিখারী কিংবা তাচ্ছিল্য, যেটাই বলা যাক না কেন, দুগ্‌গা নামই বোধ হয় তাকে মানিয়েছিল। নজরুল এবং শৈলজানন্দ শেকার সাহেবকে একদিন পাকড়াও করলেন এই বলে, তাঁরা দু'জনে তাঁর কাছে ইংরেজী শিখবেন। সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'যেয়ো। পয়সা নিয়ে যেয়ো কিন্তু। দু-আনায় একটা মস্তবড় পেঁপে দেব। পেয়ারা দেব আনায় দুটি।' শৈলজানন্দ ও নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন সাহেব গরিব। ফল-ফুল, হাঁস-মুরগি বিক্রি করে সংসার চালায়।

শৈলজানন্দ ও নজরুল দুইজনই মরিয়া। ইংরেজি শিখতে হবে একেবারে ইংরেজদের কাছ থেকে। সাহেবের বাড়ীতে যেয়ে প্রথমেই তার মেয়ে মতির সাথে পরিচয় হল। মেয়েটা বাংলায় কথা বলে। মূল ঘটনার অবতারণা হল পরে। সাহেবের বাড়ীতে একটি ছেলে আসে তার নাম দুগ্‌গা। সাহেবের স্ত্রী তাকে আদর করে। খাবার থাকলে খাইয়ে দেয়। দুগ্‌গা সাহেবের বাড়ী থেকে তার ঘড়ি চুরি করে আর একজন খ্রিস্টানের কাছে বিক্রি করেছিল। এতে সাহেব দুগ্‌গার পরে ক্ষেপে যায়। দুগ্‌গা প্রায়ই সাহেবের বাড়ীতে গোপনে আসে। শৈলজানন্দ ও নজরুলের উপস্থিতিতে দুগ্‌গা সাহেবের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং সাহেব তাকে বেদম মারধোর করে। সাহেবের স্ত্রী তাকে থামাবার চেষ্টা করতে গিয়েও পারে না। শৈলজানন্দ ও নজরুল তখন ঘড়িটা উদ্ধারের ব্যবস্থা করলে সাহেবের স্ত্রী তাদের দুজনকে বললেন, উদ্ধারের জন্য কারো টাকার প্রয়োজন হলে তিনি তা দেবেন। ঘড়িটা উদ্ধার হল। জানা গেল দুগ্‌গা সেটা চুরি করেছিল। এদিকে নজরুল সাহেবের বাড়ীতে মতির মায়ের কাছে এলে কেমন যেন উদাস হয়ে যেত। শৈলজানন্দ এই ঘটনার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

"নজরুল ছিল একটু অশান্ত চঞ্চল, কিন্তু মতির মার কাছে এলেই লক্ষ্য করতাম, সব চঞ্চলতা তার স্থির হয়ে যেত, চুপ করে বসে বসে কী যেন ভাবত, একটি কথাও বলত না। এ দিকে দুগ্‌গাকে নিয়ে পাড়ায় অশান্তি। সবাই মনে করতো দুগ্‌গা চোর। সে চুরি না করলেও তার কপালে মার জুটতো।

ইতোমধ্যে নজরুল ও শৈলজানন্দ ঠিক করলেন তারা, যুদ্ধে যোগ দেবেন। পাড়ার লোক দুগ্‌গাকে সাথে নিয়ে যেতে বল্‌লো। পাড়া জুড়োবে। এসে দেখা গেল দুগ্‌গা স্টেশনে রেলের কামরায়। শীতের সময়। দুগ্‌গা কি করবে। দেখা গেল তার কছে একটা মোড়কে সোয়েটার রয়েছে। কোথা থেকে পেয়েছে সে বলতে চায় না। জানা গেল মতির মা-ই দুগ্‌গার মা। দুগ্‌গা তার আগের পক্ষের ছেলে। শৈলজানন্দ ও নজরুল অবাক হয়ে যান। আরো অবাক হন, যখন দেখেন দুগ্‌গার মাও স্টেশনে এসেছে দুগ্‌গাকে বিদায় দেয়ার জন্য। মা ও ছেলে উভয়ের চোখে অশ্রু।

ঘটনাটি ছোট। কিন্তু দুগ্‌গার মা একজন আসাধারণ মা। প্রথমেই তাঁকে দেখে নজরুলের নিজের মায়ের কথাই মনে পড়েছিল। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে চুরুলিয়াতে মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন নজরুল। কিন্তু পরে তাঁর গ্রামে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে যাননি আমৃত্যু। বাবার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে মায়ের বিবাহ তিনি স্বীকার করতে পারেননি। এ যেন শেকস্‌পীয়রের হ্যামলেটের মতো অবস্থা নজরুলের। মায়ের মৃত্যুর সময়েও তিনি গ্রামে যাননি। এই ঘটনাটিকে নিয়ে অনেক সমালোচক নজরুলকে দায়ী করেছন। কিন্তু তাঁরা কেউই নজরুলকে বুঝতে চাননি। নিজের মাকে নজরুল কাছে না পেয়ে অন্যদের মাকেই নিজের মা বলে ভেবে নিজের মায়ের অভাব দূর করতে চেয়েছেন। নজরুলের চরিত্রে এটিও একটা বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেকটা একরোখা ছিলেন। নার্গিসকে বিয়ে করতে গিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল নজরুল সেখানেও নিজেকে মানিয়ে নেননি। নার্গিসকে নিয়ে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন সেখানেই তাঁর মনোকষ্ট ফুটে উঠেছিল। আজীবন তিনি আবেগপ্রবণ ছিলেন। এই আবেগকে তিনি প্রদমিত করেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তিনি তার আবেগ থেকে কখনও সরে আসেননি।

মানুষ-নজরুল :

শৈলজানন্দ বলেন, আমার কাছে কবি-নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক বড়ো। একই দেশে আমাদের বাড়ী, একই জল-হাওয়ায় আমরা মানুষ হয়েছি, নজরুল আমার সহপাঠী, বাল্যবন্ধু। তাকে যখন আমি ভালবেসেছিলাম, অনেক বন্ধুর মাঝখান থেকে আমরা যখন একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তখন আমরা কেউ সাহিত্যের ধারও ধারতাম না।

আমি সেই নজরুলকে চিনি যে নজরুল ইকড়া গ্রামের বাবুদের বাড়ী বাসন্তীপূজোর সময় ভাঙা প্রাচীরের উপর বসে যাত্রাগান শুনছে, যে নজরুল 'লেটো'র দলে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে, সে নজরুল সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পড়ছে।

যেখানে সাধু-সন্ন্যাসী নাঙ্গা-ফকির–সেইখানেই নজরুল। শুনেছে সিয়ারশোলের শিশু-বাগানের কাছে একটা গাছের তলায় একদল ফকির বসে আছে। আমাকে ডাকতে এলো।–চলো দেখে আসি।

গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।

ওদিকে তখন পশ্চিম-আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো। দু'জনে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছি। ওদিকটা ছিল তখন জনহীন বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। কাঁকর পাথরে হাঁটুর কাছে খানিকটা চামড়া ছড়ে গেলো, খানিকটা রক্তও পড়লো। নজরুল তার নিজের কাপড় দিয়ে চেপে ধরলো জায়গাটা। তার কাপড়টা রক্তে ভিজে গেলো। বললাম, 'একি করলে।'

–'ও কিছু না। সাবান দিলেই উঠে যাব।'

সেদিক দিয়ে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আমাকে তক্ষুণি সুস্থ করে তুলতে চায়। বললে, 'হাঁটুতে পারবে?'

–'নিশ্চয় পারবো, চলো।'

ঝড়ের বেগ থেমে এসেছে। আমাদের আর দৌড়াতে হচ্ছে না।

নজরুল বললে, 'আমি একবার গাছে উঠে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আর-একবার–এই দেখো, সাইকেল চড়া অভ্যেস করতে গিয়ে সাইকেলের চেনে কেটে গিয়েছিলো অনেকখানি।'

এ সব কথার অবতারণ–আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি।

রাণীগঞ্জে তখণ ওষুধের দোকান বলে কিছু ছিল না। ডাক্তারের কাছেই ওষুধ পাওয়া যেতো। সাধনের দাদা সবে ডাক্তারী পাস করে এসেছে। রাস্তার ধারেই সাধানের বাড়ী। নজরুল দাঁড়ালো সেইখানে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কি হবে?'

সামনের ঘরেই বসেছিলো সাধনের দাদা। সে তখন আমাদের দেখতে পেয়েছে।–'এই যে মানিকজোড়! বাঃ বেশ মানিয়েছে দুটিকে! একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। আর-একটি কোথায়? সেই ক্রিশ্চান ছেলেটি। শৈলেন?'

নজরুলকে বলার অবসরই দিচ্ছে না। ডাক্তার ভেবেছিলো আমরা সাধনকে খুঁজছি। বললে, 'সাধন বাজারে গেছে।'

নজরুল বললে, 'একটু টিনচার আইডিন দেবেন?'

–'কি হবে?'

নজরুল আমার পা'টা দেখিয়ে দিলে।

ডাক্তার রসিকতা আরম্ভ করলে–'গাছে উঠেছিলে বুঝি? তা বেশ হয়েছে। হাত-পা ভেঙে গেলেই ভালো হতো। টিনচার আইডিন লাগাতে হবে না। রাস্তার ধুলে খানিকটা ঘষে-ঘষে ওখানে লাগিয়ে দাও–ভাল হয়ে যাবে।'

আমি তখন নজরুলের হাত ধরে টানছি।

ডাক্তার বললেন, 'না ভাই, টিন্‌চার আইডিন নেই আমার কাছে।

এই তো সবে ডাক্তারী পাস করলাম। ডাক্তার হয়ে বসি, তখন ওষুধপত্র সবই পাবে।'

নজরুলকে রাস্তায় টেনে এনে বললাম, 'টিন্‌চার আইডিন আছে আমাদের বাড়ীতে।'

নজরুল বললে, 'গিয়েই লাগিয়ে নাওগে। আর-একটা খুব ভালো ওষুধ আমি জানি। কাল দেবো।'

–'তাই দিও। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেরি হলে বকাবকি করবে। আমি পালাই।'

দু'জনে খুব কাছাকাছি থাকি। নজরুল গেল তার সিয়ারশোল স্কুলের মোহমেডেন্ বোর্ডিং এ। খড়ে ছাওয়া মাটির একখানি ছোটো ঘর। পাঁচজন মুসলমান ছাত্রের খাবার-থাকার জায়গা। আর আমি গেলাম আমার আস্তানায়। রায়-সাহেবের প্রকাণ্ড লাল-কুঠির নীচের তলার একখানা ঘরে।

পায়ে টিন্‌চার আইডিন লাগালে ভালা হতো। কিন্তু দোতলায় বাড়ীর গিন্নির কাছে গিয়ে চাইতে হবে। সিড়ির কয়েকটা ধাপ এগিয়ে গিয়েও নেমে এলাম। এই মেয়েটির ভয়ে আমাকে সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। এইটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। টিন্‌চার আইডিন কেন চাইছি বলতে হবে। হাঁটুর কাছে ছড়ে যাওয়া জায়গাটা দেখাতে হবে। আছাড় খেয়েছি বললে সে বিশ্বাস করবে না। বিশ্রী একটা অপবাদ রটিয়ে সারা বাড়ীতে একটা হৈ-চৈ না বাধিয়ে ছাড়বে না। যার একটা বন্ধু মুসলমান আর একটা ক্রিশ্চান, সে কখনও ভালো ছেলে হতে পারে না।

তার চেয়ে কাজ নেই টিন্‌চার আইডিন লাগিয়ে।

একটা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে বসলাম।

খানিক পরেই দেখি নজরুল এসে দাঁড়ালো। তার দু'হাত ভর্তি অনেকগুলো নিমের পাতা। বললে, 'এইগুলো বেশ করে বেটে ওইখানে লাগিয়ে নাও। ব্যথা-বেদনা কিছু থাকবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে নিমপাতা কোথায় পেলে?'

–'নিমগাছ খুঁজতেই তো দেরি হয়ে গেল। শেষে মনে পড়লো ক্রিশ্চানদের কবরখানার মুখে সেই বড় নিমগাছটার কথা।'

দিনের বেলাও সে নির্জন জায়গাটার কেউ ত্রিসীমানা মাড়ায় না, ভয়ে গা ছম্ ছম্ করে।

বললাম, 'এই অন্ধকারে তুমি ওই গাছটায় উঠতে গেলে কেন? গাছটায় ভুত আছে।'

নজরুল বললে, 'তোমার মুণ্ডু আছে।'

এই বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেলো। জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলো আমি আইডিন লাগিয়েছি কি না।

ভালই হলো, আমি বেঁচে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারতাম না।

আবার না ফিরে আসে, তাই দোরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

না, ফিরে সে এলো না। শুধু দেখলাম তার কাপড়ে আমার রক্তের দাগটা তখনও জ্বল জ্বল করছে।

এই নজরুল!

চওড়া বুকের ছাতি, বড়ো বড়ো চোখ, স্বাস্থ্যোজ্জল সুন্দর দেহ। মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না–এই যা দুঃখ। আমার মাথার চুল খুব সুন্দর। কেমন করে সুন্দর হলো বুঝতে পারি না লোকে ভাবে, বুঝি মাথায় বড়ে বড়ো বাবরি চুল আমি সখ করে রেখেছি। কিন্তু তা নয়। চুল কাটবার পয়সা পাই না, এমন কি আঁচড়াবার একটা চিরুনি পর্যন্ত নেই।

নজরুল বলে,'তোমার অমন চুল কেমন করে হলো তাই বলো।'

আমরা তখন পনেরো-ষোলো বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দু'জন দুটো ইস্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছাকছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামরাঙা গাছ থেকে পেড়ে নুন দিয়ে দিয়ে খাই, একসঙ্গ বেড়াতে যাই, সুখ-দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনক। তাদের ভেতর একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নজরুল ছোটো ছোটো গল্প লেখে, আমাকে শোনায়। আমি কবিতা লিখি-নজরুলকে শোনাই। আর-কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না। শোনালে বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

একমাত্র শৈলেন শোনে মাঝে-মাঝে। শোনে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। বলে, ওগুলো ছিড়ে ফেলে দাও। কিছু হয়নি।'

আমাকে রাগায়। বলে, 'ওর জন্যেই বুঝি চুল রেখেছো? চুল রাখলেই কবি হয় না।'

নজরুলকে বলে, 'তুমি গদ্য লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না। এই আমি বলে রাখছি।'

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না। শৈলেন ছিলো আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ আর ইহজগতে নেই।

কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে-আমরা আমাদের পেশা বদলে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প, নজরুল লিখছে কবিতা।

মাঝখানে কিছু দিনের জন্য নজরুল ছিলো করাচিতে।

শৈলেন আর আমি সেই ফাঁকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতায় এসেছি।

নজরুল এলো করাচি থেকে। হল সৈনিক-কবি।

তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। গান শিখছে, গান গাইছে, সভায় সমিতিতে, বাড়ীর আড্ডায়, ছেলেদের হোস্টেলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। আর মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সদ্য পরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিতরুচি শিক্ষিত মানুষর মজলিস। সংখ্যা অগণ্য।

আর এখানে আমরা নগণ্য মাত্র তিনজন। নজরুল, আমি আর শৈলেন।

আবার যেন আমরা সেই পুরোনো দিনে ফিরে যাই। এখানে কবি বলে নজরুলের আলাদা কোনও সম্মান নেই। সবাই এখানে অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শান্তি পুরী পোশাকী ভাষায় কথা বলা তখনও ভালো রপ্ত হয়নি। আমানের জন্মভূমি সেই রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত মাতৃভাষায় প্রাণ খুলে কথা বলে আর হো-হো করে হাসা।

এমন সব কথা, এমন সব গল্প, যা ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে তাই বলে। যে গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় সেই গানটি শোনায়। যে কবিতাটি সবে লিখেছে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, 'যাক্, এতদিন পরে আমার কথাটা আমি withdraw করে নিলোম। তবে withdraw করবার দরকার হতো না যদি না তোমাদের লেখা দুটো তোমার পাল্টা-পালটি করে নিতে। তুমি যদি গল্প লিখতে, আর শৈলজা যদি কবিতা লিখতো তাহলে তোমরা দু'জনেই মরতে।'

আমি বললাম, 'নজরুল এখনই-বা বেঁচে আছে কোথায়? সবাই হৈ-হৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে-গান গাও, কবিতা শোনাও। বাহবা দিচ্ছে, প্রশংসা করছে।...কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে ও বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না। একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে। কি কষ্টে যে ওর দিন চলছে তা আমি জানি। যে গল্পগুলো ও লিখেছিলো তার কপিরাইট বেচার জন্যে বসে আছে। তাও তো আফজল্ বলছে একশো টাকার বেশি দেবে না।'

এই কথাগুলো কেউ শোনে নজরুল তা পছন্দ করে না। হে-হে করে হাসে আর অর্গ্যানের সুর তুলে আমার কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

আমি তিরস্কার করলাম নজরুলকে। –'হে-হৈ করে হাসছে দেখো। যারা দু'পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে গাধার মতো খাটিয়ে নেয় তাদের বলতে পারো না।'

নজরুল বলে, 'তাদের কি বলবো? আচ্ছা বোকা তো!'

–'তাদের বলতে তুমি যাবে না, তোমাকে লিখতে হবে। টাকার দরকার। দুটো কবিতা লিখলে কুড়ি টাকা তো পাবে।'

শৈলেন বললে, 'ও বলবে, তবেই হয়েছে। টাকার কথা ও কখ্খনো কাউকে বলতে পারবে না। মাথায় চুলের দুঃখু ছিলো ওর চিরকাল। এখন চুলগুলো বাগিয়েছে, কবি-কবি চেহারা হয়েছে, ব্যস, ওইতেই খুশী।'

নজরুল চুলের প্রশংসায় ভারি খুশী। বললে, শৈলজার মতো হয়েছে?

আমি বললাম, 'আমি এবার চুলগুলো কেটে ফেলবো কিন্তু।'

নজরুলের খুব আপত্তি। –'না না, কাটবে না।'

শৈলেন বলেছিলো, ' তা না হয় কাটবে না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা করে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরি করিয়ে দেবো। সত্যি বলছি, দোহাই তোমার, মহাদেব হবার চেষ্টা করো না। সব ব্যাটা সমুদ্র মন্থন করে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থেকো না। আমরা সহ্য করতে পারবো না।'

নজরুলকে নিয়ে এমনি রসিকতা করতো শৈলেন।

নজরুল হো-হো করে হাসতো আর বলতো, 'আমি হবো না হবো না হবো না তাপস, যদি না পাই তপস্বিনী। মহাদেব হবো কেমন করে? পার্বতী কোথায় পাবো?'

শৈলেন বলতো, 'বাবুদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘন-ঘন ডাক আসছে তোমার পার্বতী একটি জুটে যাবে ঠিক।'

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

সে যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না।

নজরুল চেয়েছিলো শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভিতর থকে স্বতঃউৎসারিত পরমানন্দ। টাকা নয়, পয়সা নয়, ক্ষুধার অন্ন নয়, পার্থিব কোনো সম্পদ নয়, সুর সুন্দরের কাছে থেকে সে আনন্দ তার আপনিই আসে। সেই আনন্দে সে দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকে।

'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম!'

সেদিন তার খাবার সময় আমি তার আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম।

বাইরে কয়েকজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে; তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

খেতে বসবার আগে নজরুল আমাকে বললে, 'খাবে?'

আমি বললাম, 'না।'

কাছে গিয়ে দেখলাম কাঁচের একটি ডিসের উপর কয়েক মুঠো ভাত, একটি প্লেটের উপর তিন টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল।

যে দুটো ডেকচিতে রান্না হয়েছিলো সে দুটো খালি পড়ে রয়েছে। তাতে আর অবশিষ্ট কিছুই নেই।

বিশ-পঁচিশ বছরের যে ছোকরাটি রান্না রে সে এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি খাবে না? নেই তো কিছু।'

লোকটি বললে, 'আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।'

নজরুল বলে উঠলো, 'কেন, হোটেলে খাবে কেন?'

লোকটি বললে, 'আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাইয়ে দিলেন যে!'

এতক্ষণে মনে পড়লো নজরুলের। বললে, 'ধৎ, সে আমার বন্ধু কেন হবে? সে এসেছিলো আমার কাছে টাকা ধার করতে।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে আমার মেলা টাকা।'

–'তাই বুঝি তাকে খাইয়ে বিদায় করলে?'

নজরুল বললে, 'না না, দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, 'দু'দিন ভাত খাইনি।'

বললাম, 'তাকেই তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠাতে পারতে?'

নজরুল বললে, 'দশ টাকার একটি নোট ছাড়া আমার কিছু ছিলো না যে। টাকা পয়সাগুলো আমার কাছে আসতেও চায় না, থাকতেও চায় না। আমার সঙ্গে কী শত্রুতা যে আছে তাদের কে জানে।'

–'সেই দশ টাকর নোটটি তাকে দিলে বুঝি?'

নজরুল বললে, 'হুঁ। ভারি লজ্জা করছিলো। চেয়েছিলো একশো টাকা, দিলাম মাত্র দশটি টাকা।'

রাঁধুনী ছোক্তাটি দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। তাকে দেখিয়ে বললাম, 'এখন ওকে কি দেবে দাও।'

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকালে আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোক্তাকে আমি দিতে গেলাম। সে নিলে না কিছুতেই। বললে, 'টাকা আছে আমার কাছে।'

নজরুলের মুখে হাসি ফুটলো। 'এই দেখো, সবাইকার কাছে টাকা থাকে, আমার কাছে থাকে না।'

ছোক্তাটি বললে, 'হোটেলে আমাকে খেতে হতো না, যা রান্না করেছিলাম ওতেই কুলিয়ে যেতো, কিন্তু তিনজনের খাবার লোকটা একাই খেয়ে ফেললে।

নজরুল ধমক দিলে। ধ্যেৎ, ওরকম করে বলতে নেই। আমি ওর মুখে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম বেচারার খুব খিদে পেয়েছিলো। খেয়েছে, বেশ করেছে।'

খাওয়া শেষ করে হাত-কাটা ফতুয়ার উপর বাসন্তী রঙের চাদরটি গায়ে দিয়ে চটি পরে পানচিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছিল নজরুল, আমাকে বললে, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

বললাম, 'খুব হয়েছে। তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি যাবো পুবে।'

নজরুল বললে, 'গাড়ী এনেছো তো? মোটরকার?'

মোটরকার এলে আর রক্ষে নেই। যেখানে খুশি তাকে নিয়ে যেতে পারো।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল–এই মোটরে চড়ার সখটা তার গেলো না কিছুতেই। মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তো ও তক্ষুণি যেতে রাজী হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কি, বিকেলে শৈলেনদের বিডন স্ট্রীটের বাড়ী তে বসে বসে গল্প করছি শৈলেনের সঙ্গে, এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে নজরুল ঢুকলো। আমাদের কাছে হাত পেতে বললে, 'চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে পাঁচ টাকা। নজরুলের পকেটে ছিলো মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে, 'এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার দিলাম। ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। যদি না দাও তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে আমি আদায় করবো।'

তার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। মানে অর্গানের সামনে। বললে, 'তুমি তো খ্রীস্টান ছিলে, হিন্দু হলে কবে?'

শৈলেন বললে, 'হয়েছি তোমার জন্যে।'

–'তা বেশ করেছো। সেই রাণীগঞ্জ থেকে ধরলে অনেক টাকা তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাততঃ দু'পেয়ালা চা দাও।'

শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, 'দু'পেয়ালা কেন?'

নজরুল বললেন, 'লাখ পেয়ালা চা না খেলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে আমার এখনও দু'পেয়ালা বাকি আছে।'

শৈলেন বলেছিলো, 'লাখ পেয়ালা চা খেয়ে চালাক তুমি হবে কি না জানি না; কিন্তু মদ্যপান যদি করতে পারো তো নিঘঘাৎ মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে –– সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।'

আমাদের দুর্ভাগ্য, শৈলেন অনেকদিন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নজরুল আজ সত্তর বছরের বৃদ্ধ। সারাজীবনে সে মদ্যপান দূরের কথা, ধুমপান পর্যন্ত করলে না। কাজেই সে মাইকেল হলো কি না শৈলেন দেখে যেতে পারলো না।

কিন্তু যা সে হয়েছে তাই-বা ক'জনে হতে পারে?

যা সে পেয়েছে তাই-বা ক'জন পায়?

কবি এবং গীতিকার নজরুল সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

নজরুলের মৃত্যুর আগেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন শৈলজানন্দ। নজরুল তখন বাকশাক্তিহীন। এত যে কাছের মানুষ ছিলেন শৈলজানন্দ, সেই মানুষটিকেও চিনতে পারেন নি নজরুল। বাংলাদেশ তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়েছে। নজরুল তা দেখেছেন। কিন্তু অনুভূতি শূন্য হওয়ায় কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেননি তিনি। নজরুলের শেষ ইচ্ছাটাকে পূরণ করেছেন তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার। নজরুল সমাধিস্তু হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের পাশে।

নজরুল জীবনের অমর গাঁথা শৈলজানন্দের 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'। তিনি অনেক অনালোচিত দিকের আলোচনা করেছেন গল্পের মাধ্যমে। নজরুল চরিত্র সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। শৈলজানন্দ বলেছেন, নজরুল ধুমপান, মদ্যপান কিছুই জীবনে করেননি। প্রেম ছিল তাঁর একটা বড় আবেগের বিষয়। তিনি বারবার প্রেমে পড়েছেন, তা না হলে তাঁর লেখা এমন হতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি চরিত্রহীন ছিলেন না। এ কথা সত্য যে, মেয়েরাই তাঁকে বেশী ভালবেসেছে। একটি বিবাহিত হিন্দু মেয়ে তাঁর গলার মালা নজরুলের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল তাঁর গান শুনে। এ জন্যে কম মাশুল দিতে হয়নি সেই মেয়েকে। স্বামী গৃহে তাঁকে লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছে।

মানুষ হিসেবে নজরুল যে কত মহৎ ছিলেন তার বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থে। শৈলজানন্দ অতিরঞ্জন করেছেন কিনা, তা জানি না। কিন্তু বন্ধুকে তাঁর এই গ্রন্থে যে বন্ধনে বেঁধে রাখলেন তিনি, আজীবন নজরুল ভক্তদের কাছে নজরুলের সাথেই তাঁর স্মৃতিও অমলিন হয়ে থাকবে।